বামপন্থ নেপাল মজুমদারের গদ্যবীক্ষা: জাতীয় প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সন্ধিৎসা

সুমিতকুমার বড়ুয়া

১

নেপাল মজুমদার বামপন্থী মতাদর্শে দীক্ষিত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মননের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড (১৯৬১), দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৩), তৃতীয় খণ্ড (১৯৬৮), চতুর্থ খণ্ড (১৯৭১), পঞ্চম খণ্ড (১৯৭৩) এবং ষষ্ঠ খণ্ডে (১৯৮০) তাঁর নিরন্তর জিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটেছে। এই গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ডের 'লেখকের কথা'য় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — কবি ছিলেন দেশমানব তথা বিশ্বমানব। কবির দেশভাবনায় ও বিশ্বভাবনায় সারা বিশ্বের মানুষ স্থান পেয়েছে। কবির প্রখর বিবেকবুদ্ধি কবির তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল স্পর্শচেতন মন, সর্বোপরি মানুষের প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভালোবাসাই বিশ্বমানবের দুঃখে, অশান্ত ও অস্থির করে তুলেছিল। স্বদেশেই হোক বা বিদেশে, তাঁকে ক্ষুব্ধ পৃথিবীর দেশে দেসে যেখানে যখনই মানুষ অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়েছে তখনই তখনই কবি তাঁদের উদ্দেশে সহানুভূতি ও মর্মবেদনা জানিয়ে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন। পক্ষান্তরে অত্যাচারী ও উৎপীড়কের বজ্রনির্ঘোষে তিরস্কার করে যেন এক মূর্ত লুণ্ঠন ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ শোষণ, উৎপীড়ন, অত্যাচারের বিনিপাত করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ও বজ্রদীপ্ত সংগ্রামী সংগ্রামী মূর্তিতেই আপসহীন সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথ 'সবচেয়ে বেশি দীপ্তিমান', 'সবচেয়ে বেশি মহান' রূপে প্রকাশমান, তাঁর অন্যান্য সব দিকই যেন এর সামনে 'ম্লান ও নিষ্প্রভ' হয়ে গেছে বলে শ্রীমজুমদার দাবি করেছেন। এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থেকে রবীন্দ্রজীবন ও কর্মসাধনার উপর তিনি আলোকপাত করতে চেয়েছেন।

এই গ্রন্থমালায় শ্রীমজুমদারের পরিশ্রম আর চিন্তনের মহাকাব্যিক বিস্তার সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি নিজে এই গ্রন্থমালাকে 'সিরীয়াস গবেষণাগ্রন্থ' বলেছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক কালিদাস ভটাচার্য শ্রীমজুমদারের অতুলনীয় কাজকে অত্যন্ত যত্নে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে 'বিরাট perspective-এ লেখা' 'সুন্দর বই' বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় খণ্ডের পাঠপ্রতিক্রিয়ায় নীহাররঞ্জন রায় শ্রীমজুমদারের গ্রন্থকে 'a very valuable piece of work' বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীমজুমদার পূর্ব নির্ধারিত কোনো বিশ্বাস থেকে নয়, স্বচ্ছ

মন নিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য অধ্যয়ন করে রবীন্দ্রচিন্তার ভাব বিন্যাসগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কোন পর্বে কোন্ মত ও পথের সমর্থক ছিলেন, তাঁর কোন্ চিন্তা ও কর্মের কী প্রতিক্রিয়া দেশে হয়েছে, তাঁর কথা আর কাজ সমসাময়িক চিন্তক-লেখকরা কীভাবে প্রতিগ্রহণ করেছেন, শ্রীমজুমদার নানা প্রামাণ্য গ্রন্থ, চিঠিপত্র, পত্রপত্রিকার যুক্তি পরম্পরায় শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন। এটি কেবলমাত্র সুবিশাল তথ্যের আকর গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ না থেকে 'রবীন্দ্রজীবনী ও সাহিত্য ভাষ্য', 'জাতীয়-ইতিহাস-সমীক্ষা' হয়ে উঠেছে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনের ভূমিকা গুরুত্বময়। ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগ থেকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ (১৪৫৩—১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) — এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী জ্ঞানবিজ্ঞান ও মনীষার উন্মেষ দেখা যায়। ইউরোপের বিশেষ সমাজ-আর্থনীতিক ব্যবস্থায় বলিষ্ঠ বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে বাংলার নবজাগরণের প্রেরণা বাস্তব সমাজব্যবস্থা থেকে যতটা না এসেছে, তার বেশি এসেছে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের রসাস্বাদনের ফলে, এবং তাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শাসন উপলক্ষে আমদানি হয়ে। বাংলার দর্শন ও সমাজবিপ্লবের প্রেরণা ও তাগিদ সমাজের ভিতর থেকে আসে নি। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের ধার করা প্রাণপ্রবাহ সংস্কারবাদের খাতে ধীরে ধীরে সমাজে প্রবাহিত হয়েছিল। তাই দর্শনবিপ্লব না হয়ে হল ধর্মসংস্কার, সমাজবিপ্লব না হয়ে হল সমাজসংস্কার, বৈপ্লবিক রাজনীতি না হয়ে হল নিয়মতান্ত্রিক ও সংস্কারবাদী রাজনীতি। সর্বত্রই সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের আপসরফা ঘটে সংস্কারবাদকে সংগ্রামের নীতি-কৌশল হিসাবে গ্রহণ করে হয়। কিন্তু এই সংস্কারবাদী আন্দোলনকে নেপাল মজুমদার 'প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের পূর্বপ্রস্তুতি' হিসাবে গ্রহণ করলেও দেশের বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীদের এই সংস্কারবাদী আন্দোলন দেশের বৃহত্তম জনগণের চেতনাকে ছুঁয়ে যায়নি এই কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

নবজাগরণের যুগ থেকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বুর্জোয়া সমাজের অনুকূল সমাজ-আর্থনীতিক অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার, স্বদেশপ্রেম মাতৃভাষা ও শিল্প-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার প্রভৃতি আন্দোলনে তাঁদের সকল উদ্যম ও শক্তি নিয়োজিত করে এসেছেন। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ যুগের শ্রেষ্ঠপুরুষ রামমোহন রায় 'আধুনিক বাংলা তথা ভারতের প্রকৃত জনক', 'দেশের জাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী ভাবধারার প্রকৃত জনক'। জগতের মহান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের রচনা ও চিন্তাধারার মধ্যে সেই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিরোধ-সংঘাতগুলি প্রতিফলিত হয় বলে কোন মহাপ্রাণ শিল্পীকে বুঝতে গেলে সেই যুগ এবং দেশের সমাজ ও জাতীয় জীবনের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলি ভালো করে বিশ্লেষণ করা জরুরি। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদ বুঝতে গেলে ভারতের তৎকালীন

বিশেষ বাস্তব অবস্থাটিও বোঝা জরুরি। রবীন্দ্রজীবন-দর্শন ও রাজনৈতিক মতবাদ একটা সম্পূর্ণ মতবাদ নয়, তাঁর সূচনা, অন্তর্বিরোধ, স্ববিরোধ, ক্রমবিকাশ ও পরিপক্কতা রয়েছে। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ক্রম পরিণতির ধারাটি লক্ষণীয়। এই অন্বেষণের উপাদান ও তথ্যাদি রবীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্রযুগেরমধ্যেই শুধু নয়, সে-যুগের সমাজ-আর্থনীতিকও রাজনৈতিক অবস্থা ও ক্রমপরিণতির সুদীর্ঘ ধারাটির মধ্যেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শচীন সেনের Political Philosophy of Rabindranath গ্রন্থের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদটিকে একটি বাস্তববাদী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করবার কথা বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কালান্তর গ্রন্থে লিখেছিলেন — "রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে, রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎ-সাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাঁকে পাই।"

রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে তবেই তাঁকে বোঝা সম্ভব বলে নেপাল মজুমদার মনে করেন। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে সামগ্রিক আলোচনার মাধ্যমে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনকালব্যাপী রচনাবলী, কর্মকাণ্ড, সাধনা ও চিন্তনের ক্রমপরিণতির ধারার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণে লক্ষণীয় যে তৎকালীন ভারতের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী ও গুরুতর সমস্যাগুলি তাঁর চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু হয়েছে। শুধু জাতীয় ক্ষেত্রেই নয়, তৎকালীন সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় জ্বলন্ত সমস্যাবলী তাঁকে বিচলিত করেছে। সারা জীবন কবি বিশ্বসমস্যায় গভীরভাবে চিন্তা করেছেন— অজস্র লিখেছেন, সবিস্তারে কথা বলেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কবির জীবন ও কর্মসাধনা এবং তাঁর রচনাবলীর পর্যালোচনাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ও কৈফিয়ৎ বলে শ্রীমজুমদার পাঠককে জানিয়েছেন।

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ডে কবিজীবনের প্রায় সাতান্ন-আটান্ন বছর সময়সীমার মধ্যে দেশ-বিদেশের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর এবং কবির বহুমুখী রচনা সৃষ্টিকর্ম আর ভূমিকার কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের বিষয়সূচি থেকে আলোচনার পরিসর ও ব্যাপ্তি অনুমেয়। লক্ষ্য করার মতো গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্ররচনাগুলি, যেমন — 'এবার ফিরাও মোরে',

'রাজা ও প্রজা', নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'অচলায়তন' প্রভৃতি রচনা সম্ভবত রবীন্দ্রজীবন ও কর্মের প্রকাশক, তাই এইগুলিকে সরাসরি গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের অখণ্ড তাৎপর্য অনুসন্ধানের অজস্র দৃষ্টান্ত তিনি মুন্সীয়ানার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। যেমন— কবি-কাহিনী-এর সঙ্গে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির ভাবের দিক থেকে তেমন কোনো অসংগতি বা বিরোধ নেই, কিন্তু 'দুটি কবিতাই পরস্পরের পরিপূরক ভূমিকাতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ'। কবি-কাহিনী-এর দার্শনিক ভাবাদর্শের অভাবের ভিত্তিভূমিতে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচিত, এই ভিত্তির উপর কবির উত্তরকালের বিশ্ব মানবিকতাবাদ গড়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী লেখার মধ্যে ভবিষ্যতের লেখার ভাববীজ কীভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে প্রাবন্ধিক তার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় — বউঠাকুরাণীর হাট-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, রবীন্দ্রনাথ একটি ঐতিহাসিক রাজপরিবারের কাহিনি লিখতে গিয়ে বাংলার জনজীবনের চিত্র আঁকতে ভোলেননি। অবশ্য ঐতিহাসিক দিক থেকে এইসব গ্রামবাসী নরনারীদের ঠিক প্রতাপাদিত্যের যুগের বলে মনে হয় না। এর প্রায় ত্রিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ বউঠাকুরাণীর হাট-এর কাহিনি ভেঙে প্রায়শ্চিত্ত নাটক রচনা করেন। নৈবেদ্য-এর (১৩০৭) যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা অনুসন্ধান করে শ্রীমজুমদার জানান যা এইসময় পাশ্চাত্যকে বর্জনের নামে যেন প্রকারান্তরে আধুনিক সভ্যতার বিষয়গুলিকেও বর্জন করে উপকরণহীন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে পুনরুদ্ধার করার আহ্বান জানান। এইসময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে নানা পরস্পরবিরোধী চিন্তার মধ্যে 'একটি প্রতিক্রিয়ামুখী ধারা' প্রবল হয়ে উঠতে থাকে, যা একধরনের 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ'।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর Personality (১৯১৭) ও Nationalism (১৯১৭) গ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন দক্ষতায় শ্রীমজুমদারের দক্ষতা তর্কাতীত। যেমন — লেনিনের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি গ্রন্থ ছিল তার মধ্যে Nationalism গ্রন্থের রুশ ও জার্মান — দুই ভাষারই তর্জমা ছিল। জার্মান ভাষার সংস্করণটিতে কয়েকটি জায়গায় লেনিনের নিজের হাতে দাগ দিয়ে পড়ার চিহ্ন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক দিকটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতেন না। স্মরণযোগ্য যে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেইসময়েও তিনি 'দেশের কথা' প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদ ও প্যাট্রিয়টিজ্‌মের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদে সমগ্র জাতি উন্মত্ত হয়ে যেন প্রথম মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় মত্ত হয়েছে — এইকথা রবীন্দ্রনাথের মতো সেদিন বিশ্বের আর কোনো কবি-মনীষী-চিন্তক এমন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে সমর্থ হননি। সেইদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ অনন্য এবং অতুলনীয়। প্রথম মহাযুদ্ধকালে রচিত এবং পঠিত তাঁর এই ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা Nationalism-এর জন্য তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে শ্রীমজুমদার মতপ্রকাশ করেছেন।

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী ভারতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের পটভূমিকায়রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক চিন্তার ধারাবাহিক ও বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, মহাত্মা গান্ধি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, সরোজিনী নাইডু, ডাঙ আনসারী, জহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দের চিন্তন প্রক্রিয়ার তুলনামূলক পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে। ভারতের জাতীয় ও স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থী আন্দোলনের, বিশেষত বাংলার আন্দোলনের ভূমিকা ও অবদানের ঠিক মূল্যায়ন হয়নি বলে শ্রীমজুমদার খেদ প্রকাশ করেছেন। ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও চিন্তানায়কদের রাজনীতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী এবং ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে, 'রাওলাট আইন' ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বিষয়ে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রশ্নে, খাদি ও চরকা বিতর্কে, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে, সমবায় ও কৃষি সমস্যায়, শিক্ষা সংস্কারে, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে, স্বরাজ চিন্তন ও পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধিজির সঙ্গে ভারতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাযুজ্য ও স্বাতন্ত্র্য গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

সমস্যাকীর্ণ বিরাট পৃথিবী, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের মরণান্তিক যন্ত্রণা ও দুঃখের শত শত গ্রন্থির জট পাকিয়ে ছিল। পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষীরা সমকালীন সভ্যতা সংস্কৃতির মৌলিক প্রশ্নে সংশয়িত, তীব্র অন্তর্দন্দ্বে চিন্তাকুল। এর কোন সমস্যা ভারতবাসীকে যেন স্পর্শ করেনি, চিন্তা ও সাধনায় তখনও পর্যন্ত জাতীয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীমজুমদার লিখেছেন — "এই দুর্দিনে, এদেশে বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। তিনিই জাতিকে এবং সমগ্র বিশ্বকে আশার বাণী শোনালেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পূর্ব হতেই যে সব মনীষী ও চিন্তানায়ক উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধকে বিনিপাত করিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম।" যুদ্ধের হিংস্র তাণ্ডবলীলায় গভীর দুঃখ ও বেদনায় রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হলেও এই দানবীয় হিংস্রতার প্রতিরোধ করে সমস্যার একটি সত্যকারের সমাধান ও পথের সন্ধান করেছেন। 'বিশ্বমানবতার আন্তর্জাতিক মিলন ক্ষেত্র রচনা, অপরদিকে ভারতের জাতীয় সাধনা; আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার সমন্বয় সাধনা' — রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা-ভাবনার ফলেই 'বিশ্বভারতী' কল্পিত হয় ও ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষভাগে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী', 'অসহযোগ-আন্দোলন ও কবির অন্তর্দন্দ্ব', 'স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহযোগ-আন্দোলনের স্থান', 'রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজী সাক্ষাৎকার ও অসহযোগ

বিতর্ক', 'কংগ্রেসের— প্রথম পররাষ্ট্রনীতি', 'অসহযোগ-আন্দোলনের শেষপর্বে', 'শান্তিনিকেতনে পুনরায় রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজী সাক্ষাৎকার ও চরকা-বিতর্ক' প্রভৃতি অধ্যায়ে গান্ধিজি ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক, তাঁদের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক চিন্তার তুলনামূলক সমালোচনা ও পরিচিতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী ও সাহিত্যপ্রবেশক এবং গান্ধিজীবনীকার তেণ্ডুলকারের Mahatma গ্রন্থকে আকর হিসাবে শ্রীমজুমদার ব্যবহার করেছেন। ২৯ মে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরে গান্ধিজি চরকা সম্বন্ধে কবিকে সুচিন্তিত মতামত জানাতে অনুরোধ করে পত্র দেন। অন্যদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ বাংলা দেশের কিছু বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবী গান্ধীজির চরকাতত্ত্বে প্রভাবিত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আচার্য রায় রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে চরকাবিরোধী মতবাদের জন্যে তিরস্কার করেন। আচার্য রায়কে উপলক্ষ্য করে কবি 'চরকা' (আষাঢ় ১৩৩২) প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রবন্ধে কবি পাশ্চাত্যসভ্যতার অবদান বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। অনেক যুক্তি ও প্রশ্নের মধ্যে কবির প্রধান জিজ্ঞাসাটি তাৎপর্যবহ —

"শুধু চরকাই কেন, — সমস্ত কুটির শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে কেন সামগ্রিক আর্থনীতিক পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ না করিব?" পরবর্তী প্রবন্ধ 'স্বরাজস্বাধন'-এ (আশ্বিন ১৩৩২) কবি এই ভাবনাকেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রাবন্ধিক শ্রীমজুমদারের মতে, ইতিপূর্বে 'শিক্ষার মিলন', 'সত্যের আহ্বান', 'সমস্যা', 'সমাধান', প্রভৃতি প্রবন্ধে যা বলেছেন, তাই 'অন্যভাবে ও ভঙ্গিতে' এই প্রবন্ধদুটিতে লিখেছেন।

শ্রীমজুমদার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই কবি দেশনায়কদের সামনে এই গ্রাম পুনর্গঠনের কর্মসূচী বার বার উত্থাপন করে এসেছেন এবং শ্রীনিকেতনে কিছুকাল পূর্বেই তার বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষাও শুরু করে দিয়েছেন। 'চরকা' প্রবন্ধেও ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সভ্যতাকে গ্রহণ করার প্রশ্নে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন ও অন্তর্দন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তখনই সারা ভারতে আধুনিক ও ভারী যন্ত্রশিল্প প্রসারের উপর তিনি স্পষ্ট নির্দেশ বা গুরুত্ব দিতে পারেননি। কিন্তু কৃষি এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র চরকা দ্বারা চাষীর খিদের নিবৃত্তি বা জাতীয় অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, কবির এই মত গান্ধিজির মতের চেয়ে 'অনেক বেশি যুক্তিসম্মত ও অর্থনীতি শাস্ত্রসম্মত'। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে গান্ধিজি তখনও পর্যন্ত কুটিরশিল্পের শিল্পের মধ্যে শুধুমাত্র চরকার উপরেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন, দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত কারু ও কুটিরশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের বিষয়টা তখনও তাঁর চিন্তার মধ্যে আসেনি। এবার শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন কারুশিল্পগুলি দেখার পর তিনি খুবই প্রভাবিত হন। প্রায় দশ বছর পরে তিনি নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ গঠনের সময় তা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করেন। অবশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পুনর্গঠন সমস্যা নিয়ে তারও বহু পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকটের

সময়ে গান্ধিজি চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

নেপাল মজুমদারের রক্তকরবী নাটকের আলোচনাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৩৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের যক্ষপুরী নাটক পরের বছর রক্তকরবী নামে প্রকাশিত হয় (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩১)। এই নাটকের মর্মার্থ সম্পর্কে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন। কবি নাটকটির প্রস্তাবনা ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আধুনিক যুগসমস্যা (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২), 'নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা' (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) ও আরেকটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে Red Oleanders-এর 'definite meaning', 'literary expression' (Manchester Guardian, ২৮ আগস্ট ১৯২৫) ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রশিল্প-সভ্যতায় যন্ত্র ও জীবনের, যান্ত্রিক সংগঠন ও মানুষের সজীব ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্ব সংঘাতটিই সবচেয়ে বেশি প্রকটিত হয়েছে। যান্ত্রিক সংগঠনের কারাগার থেকে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও প্রাণশক্তির বিদ্রোহ ও মুক্তির বিজয়বার্তাই শেষ পর্যন্ত নাটকে ঘোষিত হয়েছে। 'যক্ষপুরীর কারাগার যে ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা' তা নাটকে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে বলে শ্রীমজুমদার দাবি করেছেন। তিনি রক্তকরবী-র রূপক ও প্রতীক নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দক্ষতা ও সাফল্যলাভকে স্বীকার করেছেন। যক্ষপুরীর রাজা একটি অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে থাকেন যা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুঁজি বা ক্যাপিটালই হল সেই রাজা। পুঁজির ধর্ম হল ক্রমাগত নিজেকে সহস্রগুণিত করে বৃদ্ধি করা। প্রাবন্ধিক এঙ্গেলসের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্র নাটকের ভাবনার সাযুয্যের অনুসন্ধান করেছেন। এঙ্গেলস (ocialism Utopian and Scientific গ্রন্থে পুঁজিবাদী সমাজে জাতীয় রাষ্ট্রের স্বরূপ ও ভূমিকার ব্যখ্যা দিয়েছেন — "The modern state– no matter what its form– is essentially a capitalist machine– the state of the capitalists– the ideal personification of the total national capitalঙ The more it proceeds to the taking over of productive forces– the more does it actually become the national capitalist– the more citizens does it exploit." রবীন্দ্রনাথ একেই কখনও 'machine', কখনও 'organisation', আবার কখনও 'nationaism' বলেছেন যা গ্রন্থে নেপাল মজুমদার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। পুজির ক্রমাগত আয়তন ও পরিমাঙত বৃদ্ধি যখন জাতীয় স্বার্থ ও 'জাতীয় ইচ্ছার' রূপ নেয়, তখন শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষেরাও এর কাছে আত্মসমর্পণ না করে থাকতে পারে না। অর্থাৎ 'পুঁজিবাদী-সংস্কৃতির ভূত' সকলকে আচ্ছন্ন করে। প্রাবন্ধিক রক্তকরবী-র অংশ থেকে চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। চন্দ্রাকে উক্ত বিশুর বক্তব্য আংশিক উদ্ধারযোগ্য — "তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণ্টা খাবি খাচ্ছে। ঐ যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টা পরে আরও চার ঘণ্টা যোগ করে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান না। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া। সর্দার কেবল-যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে

ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।"

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে পুঁজির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, পুঁজির এই দানবীয় লোভ-বাসনার উন্মাদনা ও উত্তেজনার ঘূর্ণাবর্তে জীবন পিষ্ট, ক্লিষ্ট ও চূর্ণ। এমনকি পুঁজিবাদীদেরও রেয়াত নেই। ব্যক্তিগত ভোগলালসায় অর্থ ও সোনার অপরিমিত সঞ্চয়ে মানুষ আগ্রহী যা 'gold fetishism' বা 'money-fetishism'। ধনতান্ত্রিকসভ্যতায় জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ও বিকৃতির বীভৎসতায় রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে পীড়িত হয়েছিলেন। তাঁর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে এই যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে। মুক্ত প্রাণের যাদুকরীশক্তি নন্দিনীর স্পর্শে সারা যক্ষপুরী একদিন জেগে উঠে নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করল, এমনকি যক্ষপুরীর রাজাও। আর রঞ্জন ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ঐ দানবীয় বর্বরতার দুর্গপ্রাচীর ভাঙবার এক মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রাণের উদ্দাম তরঙ্গোল্লাস সৃষ্টি করে গেল। যন্ত্রশিল্প সভ্যতা যেখানে জীবনের মুক্তধারাকে অবরুদ্ধ করছে, অভিজিৎ ও রঞ্জন সেই অবরোধের বাঁধ ভাঙার লড়াইয়ে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে। রক্তকরবীর বাণী শাসকের পদানত না থেকে আপোষহীন সংগ্রামের বাণী। নাটকে যবনিকা পাতের আগে বিক্ষুব্ধ জনতাকে রাজার জিজ্ঞাসার শেষ অংশ সম্পর্কে শ্রীমজুমদারের অভিমতটিও নাটকীয় সংবেদনায় রঞ্জিত —"মানবের রক্তপিচ্ছিল শাশ্বত যাত্রাপথের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া নাটকের যবনিকাপাত কি গভীর অর্থব্যঞ্জক নয়? রক্তকরবীর বাণী, মানবের সংগ্রামের বাণী। রক্তকরবীর গান, মানবের অন্তহীন শাশ্বত-যাত্রাপথের গান।" কবির সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণায় দেশের ও বিশ্বের সব যাবতীয় সমস্যা জুড়ে রয়েছে। দেশের ও বিশ্বের প্রধান ও গুরুতর এই সব যাবতীয় সমস্যা কী ভয়ঙ্করভাবে তাঁকে বিচলিত ও চিন্তিত করেছে — কীভাবে রবীন্দ্র মানস ক্রম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে — নেপাল মজুমদার তা বিশ্লেষণ করেছেন।

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ও গোষ্ঠীর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা ও ভূমিকার কালানুক্রমিক বিস্তারিত তথ্য-সম্বলিত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে গান্ধীজী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু, ডা: আন্সারী, খান্ আবদুল গফ্ফর খাঁ, জিন্না, মহম্মদ শফি, সৌকত আলি, সপ্রু, জয়াকার, আম্বেদকর, বিঠলভাই, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও বক্তব্যের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্মরণযোগ্য, ১৯৩০-৩৪ খ্রিস্টাব্দ বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের দারুণ মন্দা ও অর্থনৈতিক সংকটের যুগ। শুধু অর্থনৈতিক সংকটই নয়, সারা বিশ্বে বিশেষত ইউরোপীয় রাজনীতির মহাসংকট কালে ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও হিটলারী-নাৎসীবাদের অভ্যুদয় ঘটে। বিশেষত জাপানের মাঞ্চুরিয়া গ্রাস ও উত্তর চীন এবং ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ— এই দুই ঘটনায় বিশ্বের রাজনৈতিক সংকট অত্যন্ত ঘনীভূত হয়। অন্যদিকে রোলাঁ-বারবুস-আইনস্টাইন প্রমুখ চিন্তানায়কদের নেতৃত্বে যুদ্ধ,

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলন ক্রমেই বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা লাভ করে। এই আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যুক্ত থাকা তাৎপর্যবাহী ঘটনা। এই আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সংকট ও বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতের সমকালীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া ও যোগদান অর্থাৎ আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের ইতিহাসের অভিঘাত গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিত হয়েছে।

নেপাল মজুমদারের 'যুদ্ধ ও ফ্যাসি বিরোধী সঙ্ঘ' (লেখা ও রেখা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫) ও 'প্রগতি লেখক-আন্দোলনের সূচনাপর্ব' (চতুষ্কোণ, আশ্বিন ১৩৭৬) দুটি তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধে সমকালীন রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান, স্পেন, চেক, সুইস, হাঙ্গেরিয়ান, বুল্গেরিয়ান, ইতালিয়ান, সার্ব, মেক্সিকান, মিশরি, আরবি, তুর্কি, ইন্দোচিনের কয়েকজন স্বেচ্ছাসৈনিক যোগদান করেন, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সামরিক শিক্ষাহীন লেখক, শিল্পী, ভাস্কর, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, ছাত্র, যুবক, শ্রমিক। নেপাল মজুমদার উদ্দীপ্ত আবেগঘন লিখনে তৎকালীন সময়ের উত্তাপ রয়েছে— "কিন্তু যখন শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামের ডাক এল, তখন কলম, রঙ-তুলি-ইজেল, পিয়ানো-ভায়োলিন-গীটার ফেলে দিয়ে রাইফেল ও সঙ্গীন হাতে দলে দলে তাঁরা ছুটে গেলেন স্পেনের রণাঙ্গনে। সে এক অপূর্ব মহিমাময় দৃশ্য! রক্ত ও বারুদের গন্ধ ও ধোঁয়ার অন্ধকারে এই সব বিবেকী শিল্পীর প্রজ্জ্বলিত মহান অন্তরাত্মার বিচ্ছুরিত আলোকে জগৎ আলোকিত হয়ে উঠল।" স্পেনের কবি ও আধুনিক ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ কবিদের অগ্রগণ্য ফ্রেডারিক গার্সিয়া লোরকা, স্পেনের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পাব্‌লো কসালস্ প্রমুখ স্পেনের অসংখ্য লেখক, শিল্পী ও বিবেকী বুদ্ধিজীবী ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত হন। আন্তর্জাতিক বাহিনিতে যোগদান করে প্রথম দুজন ব্রিটিশ ভাস্করশিল্পী ফেলিসিয়া ব্রাউন আর মার্কসবাদী তরুণ সাহিত্য সমালোচক র‍্যালফ্ ফক্স প্রাণ দেন। এই বাহিনীতে ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল, আদ্রেঁ মালরো, আদ্রেঁ মার্তি, জেনারেল লুকাস্, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রমুখ খ্যাত অখ্যাত লেখক-শিল্পীরা যোগদান করেন। ইংলন্ডের প্রখ্যাত লেখক শিল্পী এইচঙ জিঙ ওয়েলস্, নর্মান এঞ্জেলস্, জিঙ ডিঙ এইচঙ কোল, ইঙ এমঙ ফরস্টার, ডেলাসল বার্নস্, জুলিয়ান হ্যাক্সলি, গিল্‌বার্ট মারে, ভার্জিনিয়া উলফ্, জন স্ট্র্যাচি এবং স্টিফেন্ স্পেণ্ডার প্রমুখ স্পেনের ফ্যাসিস্ট বর্বরতার তীব্র নিন্দা করে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে লেখেন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন প্যারিসে এই সম্মেলন হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় ভারতবর্ষে শিল্প ও সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। ১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। সকল মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দেশে প্রগতিশীল চিন্তার অবাধ বিস্তারের সূচনা করাই সঙ্ঘের মূল লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের পরেই কলকাতা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, দিল্লি, লাহোর, বোম্বাই, পুণা, দেরাদুন, ওয়াল্টেয়ার প্রভৃতি

দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের শাখা কমিটি গঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কলকাতা শাখার সভাপতি ছিলেন। মস্কোতে ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু (১৮ জুন ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) উপলক্ষে ১১ জুলাই কলকাতার এলবার্ট হলে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে শোকসভা পালিত হয়। ২১ জুলাই এলাহাবাদ থেকে সারা ভারত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির ৩১ জুলাইকে 'নিখিল ভারত গোর্কি-দিবস' রূপে উদ্‌যাপন করার আবেদন জানালেও তা পিছিয়ে ১৬ আগস্ট ধার্য করা হয়। কলকাতায় আশুতোষ কলাজে সঙ্ঘের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঙ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ প্রমুখ মনীষীরা সভায় বাণী পাঠান।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাবন্ধিক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ফ্যাসিজমের সূচনাকাল থেকেই রোলাঁ আর বারব্যুস ফ্যাসিজমের ভয়াবহ পরিণতি এবং তার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী নীতি ও সাম্রাজ্যলিপ্সা সম্পর্কে সতর্ক করে সারা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। স্পেনে প্রতিবিপ্লব সূচিত হলে কিছুকাল পরেই ২০ নভেম্বর ১৯৩৬ ফ্যাসিস্টদের তাণ্ডবলীলা প্রতিরোধ করার জন্যে রোলাঁ আবেদন জানান। ভারতে এই আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তুলতে লীগ এগেন্সট ফ্যাসিসিজম অ্যান্ড ওয়ারের পক্ষে রোলাঁ ও পল্‌ল্যাঁজভাঁ উভয়েই ফৈয়জপুর কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আবেদন বাণী পাঠান। ফ্রান্সিস জ্যুরদ্যাঁ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রোল্যাঁর আবেদন পাঠিয়ে নিজে ১ ডিসেম্বর ১৯৩৬-এ পত্র দেন যা রামানন্দ Modern Review (জানুয়ারি ১৯৩৭)-তে প্রকাশ করেন। রোল্যাঁর আবেদনের মর্মার্থ আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৭ জানুয়ারি ১৯৩৭) প্রকাশিত হয়। The Statesman-এ (৩ মার্চ ১৯৩৭) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আবেদনবাণী òTo the Conscience of Humanity'র আংশিক উদ্ধারযোগ্য — "Civilisation must be saved from its being swamped by barbarism At this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people– I appeal to the conscience of humanityHelp the peoplesó font in Spain– help the Government of the people– cry in million voices òHaltó to reaction– come in your millions to the aid of democracy– to the succor of civilization and culture." ১১ মার্চ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘের উদ্যোগে কলকাতার এলবার্ট হলে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যের জন্যে এক বিরাট জনসভা হয়। এইদিন স্পেন-সাহায্য-তহবিল উদ্বোধন করা হয়। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল এবং League Against Fascism And Waré-এর সর্বভারতীয় কমিটির উদ্যোগে সাপেন সাহায্য কমিটি গঠিত হয়। ১২ এপ্রিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় স্পেন সাহায্য কমিটির উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারে 'স্পেন সপ্তাহ'-এর প্রথম দিনে বিরাট জনসভা হয়। কলকাতার চ্যাটর ও যুবসমাজ এবং অগ্রণী শ্রমিকশ্রেণি এই আন্দোলনে গৌরবজনক ভূমিকা নিয়েছিল। পরের দিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা হয়। স্পেনের বিষয়ে ভারতে আন্দোলন দীর্ঘদিন চলেছিল। কেবল আবিসিনিয়া আর স্পেনের ক্ষেত্রে নয়, কিছুকাল পরে ফ্যাসিস্ট শক্তি চীন, সুদেতন ও চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করলে রবীন্দ্রনাথ এবং 'যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ' তার

প্রতিবাদে দেশে প্রবল আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে এই সম্পর্কে নেপাল মজুমদার এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, চতুর্থ খণ্ডে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্বের তথা ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তন প্রক্রিয়া ও বাস্তব কর্মসাধনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার সংঘর্ষ-সমন্বয়, নানা দল ও গোষ্ঠীর মতাদর্শ এবং কার্যকলাপের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের (এপ্রিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) পর থেকে ভারতের রাজনীতিতে এক অভিনব অধ্যায় সূচিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং গান্ধিজির কংগ্রেস ত্যাগের পর কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকা দক্ষিণপন্থী নেতারা বাহ্যত গান্ধিজির প্রতি আনুগত্য দেখালেও কংগ্রেসী রাজনীতি 'স্বরাজ্য দল'-এর নিয়মতান্ত্রিক পথেই পরিচালিত হয়। 'ভারত শাসন আইন'-এর (১৯৩৫) বিরোধিতা করলেও এই আইন পাস হলে ভিতর থেকে একে বাঞ্চাল করবার অজুহাতে নির্বাচন ও মন্ত্রিত্ব নিতে নেতারা উৎসাহী ছিলেন। নির্বাচন ও মন্ত্রীত্বের লোভে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক দলগুলি খুব সক্রিয়ভাবে সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তুলে পরিস্থিতি প্রতিকূল করে তোলে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অনতিকাল পরে জওহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের বামপন্থীদের সঙ্গে আপসকামী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের নীতিগত বিরোধ বাধে। কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন আপসকামী দক্ষিণপন্থীদের হাতে, এঙ আইঙ সিঙ সিঙ এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের ঠিক আগে সুভাষচন্দ্রের বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার ও অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মী কারাগারে। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি বামপন্থী গোষ্ঠী ও দলগুলি অসংঘবদ্ধ। বামপন্থী গোষ্ঠী ও দলগুলির ঐক্যমত্যে জওহরলাল দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে আপস করে নেন। তখন কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি এবং ব্রিটিশের দমননীতি অব্যাহত। মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখ 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' এবং অন্যান্য মামলার নেতৃবৃন্দের একে একে মুক্তি পেতে থাকলে কমিউনিস্ট পার্টি সাংগঠনিক দিক থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর বামপন্থী গোষ্ঠী ও দলগুলি সাংগঠনিক দিক থেকে নিজেদের সংগঠিত করবার সুযোগ খুঁজছিল। এন্ডারসনী দমননীতির অবসান এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করতে না পারলে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে গণসংগঠন ও গণআন্দোলনকে ব্যাপক ও দৃঢ়তর করতে না পারলে, সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে না পারলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এই নীতির ভিত্তিতে বামপন্থীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসকে দেশের বৃহত্তম সংগ্রামশীল জাতীয় ফ্রন্টরূপে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন, কিষান সভা, ছাত্র ও যুব সংগঠন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, মহিলা সঙ্ঘগুলি ব্যাপক আকারে গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। এইসব সংগঠন ও আন্দোলনগুলি ব্যাপক আকার ধারণ

করায় বিশেষত হরিপুরা কংগ্রেসের পর দলের অভ্যন্তরে ক্রমেই বামপন্থীদের প্রভাব ও শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকলে প্রবীণ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ব্যুরোক্রাট পরিকল্পিত 'ফেডারেশন স্কিম' দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব গোপনে গ্রহণের চেষ্টা করার আভাস পাওয়ামাত্র উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ তীব্রতর ঘটে।

লক্ষ্ণৌ ও ফৈয়জপুরে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রধান তাৎপর্য হল— এই প্রথম কংগ্রেস বৈজ্ঞানিক রাজনীতিক দর্শন ও অর্থনীতির ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির বিশ্লেষণ এবং কর্মনীতি নির্ধারণে নানা বামপন্থী গোষ্ঠী ও দল আংশিক সাফল্য লাভ করে। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ জগত বিচ্ছিন্ন হয়ে না থেকে তার প্রধান সমস্যাগুলিকে বিশ্বের প্রধান ও মৌল সমস্যাগুলির সঙ্গে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করা ও পৃথিবীর পরাধীন আর নির্যাতিত দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের ভাগ্যও যে একসূত্রে গ্রথিত তার উপলব্ধি করা। জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু, প্রমুখ কংগ্রেস নেতা এবং কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি বামপন্থীদের কণ্ঠে এই ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এই কালপর্বের প্রধান নায়ক জওহরলাল নেহেরু। তিনি প্রকৃত অর্থে মার্কসবাদী ছিলেন না, অন্যদিকে গান্ধিজির প্রতি আনুগত্য, আকর্ষণ ও নির্ভরশীলতা তাঁর প্রকৃতির মধ্যে পরস্পরবিরোধী প্রবণতার সমাবেশ ঘটিয়েছিল। তাও মার্কসবাদী রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি তৎকালীন 'কমিন্টার্ন'-এর সপ্তম কংগ্রেসে-(১৯৩৫) অনুসৃত আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষা ও মূল নীতিকৌশলকে গ্রহণ করে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'জাতীয় ফ্রন্ট'-এর অধীনে দেশের সমস্ত বামপন্থী গোষ্ঠী ও দলকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হন, অন্যদিকে তেমনি 'কমিন্টার্ন' নিরদেশিত এবং রোলাঁ-বারবুস পরিচালিত যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনকে এইদেশে ব্যাপক ও দৃঢ়তর করতে উদ্যোগী হন। ফ্যাসিস্ট ও নাৎসিদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে ভারতে প্রবল জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং এই কাজে তিনি কমিউনিস্ট ও কংরেস সোস্যালিস্টদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। জওহরলাল ও তৎকালীন বামপন্থীদের পরিচালিত সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে বার্ধক্যের কোঠায় পড়া রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন।

আলোচ্য কালপর্বের পৃথিবীর অত্যন্ত সংকটকালে ইতালির আবিসিনিয়া গ্রাসের পর থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব সূচিত হয়। এইসময় ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি আবিসিনিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করলে কবি এই বর্বরতা ও পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় মর্মাহত হন। গ্রন্থে কবির এই পর্বের রচনা, কবিতা, চিঠিপত্র, বক্তৃতা, বিবৃতি ও বাণীর বিস্তারিত উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের প্রেক্ষাপট ও কবির মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। স্পেনে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সময়ে বিশ্বে, ভারতে ও বাংলায় ফ্যাসিস্ট ও যুদ্ধবিরোধী সঙ্ঘের কার্যকলাপ ও কবির বিশেষ ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চীনে জাপ-আক্রমণ কিংবা ফ্যাসিস্ট ও নাৎসিদের হিংস্র বর্বরতা এবং

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তখনও পর্যন্ত গান্ধিজি কোনো প্রতিবাদ কিংবা নৈতিক সংগ্রামের আহ্বান জানান নি। ভারতে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের ওপর তিনি তেমন কোনো গুরুত্ব দেননি। এই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রেখে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা মনে করলে বিস্মিত হতে হয়। চীনের সমর্থনে এবং জাপবিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে নোগুচির সঙ্গে কবির ঐতিহাসিক মসীযুদ্ধ হয় যা শ্রীমজুমদার 'নোগুচি-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক: প্রথম পর্ব'-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পরে জওহরলালের উদ্যোগে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যে গঠিত All India Civil Liberties Union-এর অনারারি প্রেসিডেন্ট রূপে কবি এই আন্দোলনের প্রায় প্রতিটিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এইসময় আন্দামানে নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্যে দেশব্যাপী আন্দোলনে কবি পুরোভাগে ছিলেন। প্রবল আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বন্দীদের দেশে প্রত্যাবর্তনে এবং অধিকাংশ রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। এরপর অবশিষ্ট রাজবন্দী ও দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে কবি তা সমর্থন করেন। অসুস্থ ও মুক্ত রাজবন্দীদের চিকিৎসা এবং তাঁদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্যে গঠিত 'ডেটিনিউ রিলিফ কমিটি'তে কবি পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন। এই কালপর্বে গান্ধিজি বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট সমস্যায় থাকা কবিকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন তা বর্ণিত হয়েছে। কবি ও গান্ধিজির মধ্যেকার সম্পর্কও এখানে আলোচিত হয়েছে। ভারত শাসন আইন (১৯৩৫), সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও বাঁটোয়ারা বিরোধী আন্দোলন, নির্বাচন ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ, ভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন, 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত বিতর্ক, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন, নারী মুক্তি আন্দোলন, পাটকল ধর্মঘট, গান্ধির বুনিয়াদি শিক্ষানীতি, ফজলুল হক মন্ত্রিত্বের 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিল' এবং সরকারি চাকরি বন্টনের হার, 'শরৎচন্দ্র বসু ও অমৃতবাজার পত্রিকা বিতর্ক, রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক ইত্যাদি সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ সকল সমস্যায় কবির চিন্তন-মননের পরিচয় কাজে বা লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে।

এই পর্বের রাজনীতিতে কবির অবদান অনুসন্ধানের পাশাপাশি একটি সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত আমরা গ্রহণ করে শ্রীমজুমদারের বিশ্লেষণী দক্ষতার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের ছড়ার ছবি-এর সমস্ত আখ্যান ও চরিত্রচিত্রগুলি 'স্বাভাবিক ও জীবন্ত' হয়েছে। এই গ্রন্থে কোনো কষ্টকল্পনাহীন 'একটি স্বাভাবিক গতি-প্রবাহ' লক্ষ্য করেছেন। সাহিত্যে শ্রেণি-সংগ্রাম ও সমাজচেতনার অনুসন্ধানীদের শ্রীমজুমদার লক্ষ্য করতে বলেছেন যে এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ জমিদার-মহাজনদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী সুতীব্র ঘৃণা ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে চাষির স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও সংগ্রাম-প্রবণতাকে কবি অনেকখানি মহিমান্বিত রূপে চিত্রিত করেছেন। এই ছড়াগুলির ভিতরের গভীর অর্থ কোথাও আমাদের রসবোধকে পীড়া না দিলেও 'অদ্ভুত বাস্তবতা' লক্ষ করা যায়। মার্গারেট হার্কনেসকে উদ্দেশ করে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিতে সার্থক শিল্পের জন্য

এই রচনা কৌশলের ইঙ্গিত করেছিছেন বলে প্রাবন্ধিক দাবি করেছেন। এঙ্গেলসের বক্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য — "The more the author's views are concealed the better for the work of art. The realism I allude to may creep out even inspite of the authorós views."

কবির আলমোড়া যাত্রাকালে নন্দলাল বসুর কিছু স্কেচ সঙ্গে নিয়েছিলেন যা তাঁর ছড়ার ছবি-র প্রেরণাস্বরূপ ছিল। এই ছড়া-কবিতাগুলি ঠিক শিশুদের জন্যে নয়, অপেক্ষাকৃত বড়ো বালক ও কিশোরদের জন্যে লেখা। বাইরের জগতে দৃষ্টি মেলা ছেলে-মেয়েদের মনকে ছড়ার ছন্দ ও দোলার মধ্যে দিয়ে গ্রামবাংলা এবং গ্রামের গরিব মানুষের দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। সেখানে মানুষের উপর বহুবিধ সমস্যা-দুঃখ-অত্যাচার-পীড়ন-শোষণ-নির্যাতন চলেছে। পাশাপাশি বাঁচার জন্যে এই মানুষগুলির মরণান্তিক সংগ্রামের ছবিও বর্ণিত হয়েছে। যেমন — 'খাটুলী' কবিতায় গ্রামের এক গরিব বুড়ো চাষির দুঃখের জীবনকথা, 'বুধু' ও 'দেশান্তরী' কবিতায় একটি নিঃস্ব গরিব খেতমজুরের কাহিনি, 'অচলা বুড়ি' কবিতায় গ্রামের গরিব খেতমজুরদের উপর জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণ, 'সুধিয়া' কবিতার মধ্যে গ্রামের আকাল-দুর্ভিক্ষ-বন্যা এবং জমিদার-মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক গোয়ালা পরিবারের বলিষ্ঠ জীবনসংগ্রাম ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই 'মহান ও অমর সৃষ্টি' সম্পর্কে শ্রীমজুমদার মন্তব্য করেছেন— "ওঁর 'ছড়ার ছবি'-র সারা বইটি জুড়িয়া ঐ সব নাম-না-জানা গরিব পাড়ার লোকগুলি ভিড় করিয়া আছে। যাহারা মোটে সভ্য নয়, যাহারা লেখাপড়া-না-করিয়া জীবনটা মাটি বা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, — যাহারা খুবই গরিব, গায়ে যাহাদের মোটে কাপড় জোটে না— খালি গায়ে যাহারা আধখানা 'টেনা' পরিয়া সারাটা বছর রোদ-জল-ঝড়-বিদ্যুৎ মাথায় করিয়া মাঠে চাষ করে, কথায় কথায় জমিদার-মহাজন যাহাদের জুতোপেটা করে, তাহারাই না-খাইতে পাইয়া বাকি-খাজনা আর মহাজনের দেনার দায়ে সর্বস্ব খুইয়ে শহরের রাস্তায় বাহির হইয়াছে কাছের খোঁজে। এ মানুষের জন্য কবির দরদের অন্ত নাই। ছড়ার ছবি-তে এই মানুষের সুখ-দুঃখ জিয়ন-মরণ সংগ্রামের কথা।" রবীন্দ্রনাথ এসব নিয়ে সিরিয়াস কিছু না লিখে ছড়া-কবিতায় লিখলেন কেন? শ্রীমজুমদারের মতে, ক) ছেলেদের সারল্যের সঙ্গে অনক্ষর গ্রামের চাষির মনোগত সারল্যের অনেকখানি মিল থাকায় খুব সত্যিকথা খুব সহজেই বলা যায়। খ) ছড়া ছেলে-মেয়েদের গীতিকাব্য। এর দোলা, বাচনভঙ্গী, মূল সুর ছেলেবালা থেকে মানুষের মনের সঙ্গে যুক্ত। কবি সুকৌশলে ছড়ার মধ্যে দিয়ে দেশের আসল রূপ চিত্রিত করে ছেলে-মেয়েদের চেতন-অবচেতন মনের ফাঁকটুকু ভরাট করে দিতে চেয়েছেন। এই কাজকে 'শেষ বয়সে রবীন্দ্র-প্রতিভার আর একটি ভাস্বর দিক' বলে প্রাবন্ধিক অভিহিত করেছেন।

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চম খণ্ড (১৯৭৩)। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে চেক্-সুদেতেন সমস্যাকে উপলক্ষ করে আন্তর্জাতিক সংকট খুবই

ঘনিয়ে ওঠে। 'মিউনিক প্যাক্ট'-এর মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচিত হয়। আন্তর্জাতিক সংকট ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক সংকটকেও ঘনীভূত করে তোলার ফলে প্রধানত যুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংকটকাল এই খণ্ডে থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং কর্মসাধনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই কালপর্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে গান্ধিজি, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা কে কীভাবে চিন্তা করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাযুজ্য ও পার্থক্য কোথায়, তাঁদের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত সম্পর্কেরও বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতি ও পন্থার প্রশ্নে তীব্র আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, 'রয়পন্থী' প্রভৃতি নানা বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীর ভূমিকার বিবরণের তথ্যানুগবর্ণনা রয়েছে।

চেক্-সুদেতেন সমস্যাকে উপলক্ষ করে আন্তর্জাতিক সংকট খুব ঘনীভূত হয়। 'মিউনিক অ্যাক্ট'-এর (সেপ্টেম্বর ১৯৩৮) মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচিত হয়। মিউনিক প্যাক্ট অনুযায়ী যুদ্ধের সমাপ্তির পরেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করেন (১৫ মার্চ ১৯৩৯)। আন্তর্জাতিক সংকট ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক সংকটকে ঘনীভূত করে তুললে যুদ্ধ এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের (১৯৩৬) পরে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রসার বিশেষত শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্র-যুব ফ্রন্টে প্রবীণ দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের নিদারুণ উদ্বেগ ও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ালে কংগ্রেস নেতৃত্ব বামপন্থীদের প্রভাব ও শক্তিকে খর্ব করার জন্যে অগ্রসর হন। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড ডিস্পিউট বিল' এবং বোম্বাই শ্রমিকদের উপরে গুলিচালনার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমন চালানো হয়। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে বিরোধ তীব্র আঁকার ধারণ করে। বামপন্থীদের শ্রেণিসংগ্রামের ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আসন্ন যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগে তাঁরা হিংস্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে যাবেন — এই আশঙ্কায় গান্ধিজি এবং দক্ষিণপন্থী নেতারা সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সুভাষচন্দ্র নীতিগত প্রশ্নে সভাপতি পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, দেশের সকল বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলি সুভাষচন্দ্রের উপর এইজন্যে চাপ দিচ্ছিল। মৌলানা আজাদ সভাপতির পদে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালে সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করা হয়। ফেডারেশনের বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্মেন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের আলোচনা ও আপস রফার চেষ্টা চলেছে, দীর্ঘদিন থেকে বামপন্থীরা এই সন্দেহ করছিলেন যা এইসময়ে আরও গভীর হয়। এই নির্বাচনে সকল বামপন্থী গোষ্ঠী ও দলের সমর্থনে পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। সীতারামাইয়ার পরাজয়ে দক্ষিণপন্থীদের

বিশেষত গান্ধিজির প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বিস্ময়কর। এই পরাজয়কে তিনি নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করে ঐতিহাসিক বিবৃতি দিলে ঘটনাস্রোত অন্যদিকে মোড় নেয়। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত 'বামপন্থী সমন্বয় কমিটি' ত্রিপুরী কংগ্রেসে ভাঙনের সূচনা হয়। কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে তাঁরা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমালোচনা এবং সেইসঙ্গে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিষিদ্ধ করেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থীরা আবার ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন করতে থাকলে গান্ধিজির প্রস্তাবিত খসড়া অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রকে তিন বছরের জন্যে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এর এক পক্ষকাল পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

নেপাল মজুমদারের মতে, 'তীব্র স্পর্শচেতনশীল এক মহান মানবতাবাদী কবি' রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ এবং সমগ্র বিশ্বমানবের স্বার্থটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল। সেইকারণে যৌবনের সূচনাকাল থেকে অত্যাচার পীড়ন লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ঘোষণা করে এসেছেন। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে ফ্যাসিস্টদের প্রতিটি আগাসনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর সঙ্গে আক্রান্ত প্রতিটি পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রামে তিনি পূর্ণ নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সূচনা হলে কবি তার পুরোভাগেই দাঁড়িয়েছিলেন। এখানে হিংসা-অহিংসার কোনো প্রশ্ন যা গান্ধিজির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা কবির পথরোধ করে দাঁড়ায় নি। নৈতিক শুচিতা রক্ষার অজুহাতে' কবি অত্যাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষকের বিরুদ্ধে কোনো সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম বা কোনো দেশের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করতে দ্বিধা করেননি। স্পেন ও চীনের সাহায্যের জন্যে অর্থসংগ্রহের অভিযানে গান্ধিজি অনুগামীসহ এই আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন, অন্যদিকে কবি এই সংগঠিত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে গান্ধিজি যুদ্ধ আগ্রাসন, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেদবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আদৌ সচেতন ছিলেন না, বরং 'ব্রিটিশ এম্পায়ার'এর প্রতি আস্থাশীলতার কারণে তিনি 'বুয়র যুদ্ধ', 'জুলু বিদ্রোহ' এবং 'প্রথম মহাযুদ্ধ'-এ ব্রিটিশদের সহায়তা করেছিলেন। শেষজীবনে ফ্যাসিস্ট আক্রান্তদের তিনি নৈতিক সমবেদনা জানিয়েছেন মাত্র, তাঁদের সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধকে সমর্থন করতে বা পৈশাচিক দলননীতি এবং আগ্রাসনের জন্যে কখনো কঠোর ভাষায় নিন্দা করে তাদের ধ্বংস কামনা করতে পারেন নি। গান্ধিজির জীবনদর্শনে অত্যাচারী ও উৎপীড়কের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধপ্রকাশের ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ, অন্যদিকে হিটলারের বিবেক ও শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে তাঁর হৃদয় পরিবর্তনের আশাবাদী ছিলেন। আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে গান্ধিজি ও রবীন্দ্রনাথের প্রধান পার্থক্য গ্রন্থে তথ্য সহযোগে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রীমজুমদারের তথ্যনিষ্ঠা ও বিশ্লেষণী গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ খণ্ডে (১৯৮০) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) সূচনাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (৭ আগস্ট ১৯৪১) পর্যন্ত কবির রাজনৈতিক চিন্তন ও কর্মসাধনার বিস্তারিত বিবরণ আলোচিত

হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই এই কালপর্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভয়াবহ বিধ্বংসী যুদ্ধ ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড কখনো দেখা যায়নি। জার্মানি, ইতালি ও জাপান প্রভৃতি ফ্যাসিস্ট শক্তিজোটই এই মহাযুদ্ধের জন্যে প্রত্যক্ষত দায়ী এবং পরিণামে তারা সম্পূর্ণ পরাভূত ও বিধ্বস্ত হয়। এই পর্বে দেশ ও বিশ্বের যাবতীয় গুরুতর সমস্যা ও ঘটনাবলীতে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী এবং গান্ধিজি-জওহরলাল-সুভাষচন্দ্র প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ কে কীভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্র-চিন্তনের সাযুজ্য ও পার্থক্য কোথায় এবং কীধরনের তার কালানুক্রমিক তথ্য সহযোগে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সময় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং তাতে কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বাম — ফরোয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, লেবার পার্টি, রয়িস্ট প্রভৃতি দলের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক নেপাল মজুমদার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে দুটি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও শেষ পর্যায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মহাযুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বপুঁজিবাদের মহাসংকট উপস্থিত হলে ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদের উদ্ভব ঘটে। ফ্যাসিস্টরাই শেষপর্যন্ত পৃথিবীর বাজার ও উপনিবেশগুলির পুনর্বণ্টনের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। উগ্রজাতীয়তাবাদ, উগ্রবর্ণ ও সাম্প্রদায়গত বিদ্বেষ, ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন ও আগ্রাসন-লালসা এবং অত্যুগ্র যুদ্ধোন্মাদনা, সর্বোপরি কমিউনিজম এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষের উপর নির্ভর করে ফ্যাসিস্টেরা ক্ষমতায় আসীন হয়। কমিউনিজম এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষে ইঙ্গ-ফরাসি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সবচেয়ে খুসি হলেও হিটলার যখন সোভিয়েত আক্রমণ স্থগিত রেখে মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ড গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসি শক্তিকে বিধ্বস্ত করতে উদ্যত হলে তাদের চটক ভাঙে।

শান্তি, স্বাধীনতা গণতন্ত্র রক্ষা বা কোনো মহান আদর্শ বা লক্ষ্যের জন্যে নয়, শুধুমাত্রসাম্রাজ্যরক্ষা এবং নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদেই ইঙ্গ-ফরাসি শক্তিজোট নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। সোভিয়েতের প্রসঙ্গে এসে পড়লেই শ্রীমজুমদারের বাক্যবিন্যাসে আবেগের দোলা লাগে, ইঙ্গ-ফরাসি শক্তিজোটের অবস্থান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — "সোভিয়েটের প্রসারিত যে মৈত্রীর হস্তকে তাহারা বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়ার পর (২২শে জুন, ১৯৪১) অবশেষে সেই হস্তকেই তাহারা জড়াইয়া ধরিল; —সোভিয়েটের প্রত্যয়ী আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতিবশত নয়, স্রেফ নিজেদের অস্তিত্ব ও সুদূরপ্রসারী স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়াই। এর পরই গঠিত হয় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মহাজোট এবং যুদ্ধ ক্রমেই স্পষ্ট ফ্যাসি-বিরোধী চরিত্ররূপ গ্রহণ করিতে থাকে।" এই সূত্রে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতেও রাজনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠে যা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকটকে অর্থাৎ বিবদমান দক্ষিণ ও বাম— এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তিরদ্বন্দ্ব সংঘাতকে তীব্র করে তোলে। সামগ্রিকভাবে তা মৌল আদর্শ ও নীতিগত প্রশ্নে হলেও প্রধানত তা ছিল স্বাধীনতার দাবিতে ইংরেজকে চরমপত্র দান এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সংক্রান্ত। আসন্ন যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও সেক্ষেত্রে ভারতের

কী কর্তব্য এ সম্পর্কে হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীরা মহাযুদ্ধের চারিত্র নির্ণয় এবং ব্রিটিশদের সাম্ভাব্য আচরণ ও মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক বাণী দেওয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগে ব্রিটেনকে চরমপত্রদানের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তুতির কর্মসূচি নেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হন। যুদ্ধের সূচনাকালে ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে গান্ধিজির মতবিরোধ ঘটে। শ্রীমজুমদার যুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধিজির 'অদ্ভুত ও বিস্ময়কর' প্রতিক্রিয়াগুলির যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ করেছেন। গান্ধিজি কল্পনেত্রে ব্রিটেনের কীর্তিসমূহের ধ্বংস দেখে ব্রিটেনকে নিঃশর্ত সাহায্য দানের অভিমত প্রকাশ করলেন যাতে ব্রিটিশ শাসক উৎসাহিত হয়েছিল। কংগ্রেসের দলীয় বিভেদ ও অনৈক্য এবং ভারতের সাম্প্রদায়িক এবং সামন্ততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের সাহায্য লাভ করায় ধুরন্ধর ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কেরা কংগ্রেসের দাবিকে উপেক্ষা করে; অন্যদিকে যুদ্ধবিরোধী বামপন্থীদের দলনে সচেষ্ট হয়। একদিকে ব্রিটিশ শাসকদের উপেক্ষা-অবজ্ঞা, অন্যদিকে বামপন্থীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্যে ক্রমাগত চাপসৃষ্টি — এইসব কারণে কংগ্রেস হাইকমান্ডকেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি দিতে হয়। রামগড় কংগ্রেসে (১৯৪০) তাঁরা একটা সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করার আগেই সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীদের দলত্যাগের ব্যবস্থা করে রাখা হয়। বিস্ময়কর ভাবে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই কংগ্রেস থেকে দলের সঙ্গেপ্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক ত্যাগকারী, 'সর্বত্রই বাতাসে হিংসার গন্ধ' পেয়ে সুভাষচন্দ্রের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতাকারী গান্ধিজিকে সংগ্রাম পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়।

২

নেপাল মজুমদার বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হলেও তাঁর চারিত্রিক ঔদার্যের কারণে তিনি কেবল নিজের মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না নয়, অন্যদের মত ও পথের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিকল্প পথের চিন্তকদের ভাবনা প্রক্রিয়ার প্রতিও তিনি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। বামপন্থী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রীমজুমদারের মতাদর্শগত আগ্রহের কারণ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত মার্কসবাদী আদর্শের আনুকূল্য না করলেও অনেক বামপন্থীর মতো শ্রীমজুমদার তাঁর সমালোচনায় মুখর হননি, বরং সামগ্রিকভাবেই সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শের প্রতি তাঁর আস্থা লক্ষ্য করা যায়। কবি অমিয় চক্রবর্তী মতাদর্শ গত দিক থেকে শ্রীমজুমদারের বিপরীত কোটির ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর মানবহিতৈষী ভাবনার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরই উৎসাহে রবীন্দ্রানুরাগী ডাঙ হ্যারি টিম্বার্সের কর্মসাধনার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। গান্ধিজির মত ও পথে শ্রীমজুমদার প্রথম যৌবনে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে আগস্ট আন্দোলনেও যোগদান করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গান্ধিজির দর্শন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সেই বিশ্বাস নিটুট না থাকলেও তিনি গান্ধিজির গঠনমূলক কাজের গুণগ্রাহী ছিলেন। গান্ধিজির বিপরীত মতাদর্শে স্থির প্রত্যয়ী হলেও সামাজিক ও জাতীয় আন্দোলনে গান্ধিজির অবদানের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তবে

সুভাষচন্দ্র, গান্ধিজি, অমিয়চন্দ্র, টিম্বার্স প্রমুখের সঙ্গে মানস-সংযোগের অন্যতম সংযোগকেন্দ্র অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। শ্রীমজুমদার রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (১৯৬৮), রবীন্দ্রনাথ ও হ্যারি টিম্বার্স (১৯৯০), রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী (১৯৯৫), বিশ্বভারতীর বন্ধুরা: গান্ধীজী ও কয়েকজন (১৯৯৮) প্রতিটি গবেষণা গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের নিরিখে দেশকালের এক বৃহৎ প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক দর্শন ও চিন্তা-চেতনার বিস্তারিত আলোচনা নেই। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে সুভাষচন্দ্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে দেখেছেন, তাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যানুগ ইতিহাস অনুধাবন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে দেশের তথা বিশ্বের সমসাময়িক রাজনীতিক পটভূমি এবং চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার ঘাত-প্রতিঘাত ঠিকভাবে চিত্রিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ থেকে চল্লিশ দশকে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে বিশ্বসংকট যতই ঘনীভূত হতে থাকলে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক সংকট ও দ্বন্দ্ব—সংঘাত বিশেষত কংগ্রেসের মধ্যে ততই তীব্র এবং প্রকট হতে থাকে। এই সংকটকালে সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল দল-গোষ্ঠীগুলিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে সারা দেশব্যাপী এক প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামের জন্য উদ্যোগী হলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সুবিধাবাদী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের হাটে থাকায় ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রের প্রাথমিক পরাজয় ঘটে। বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলিও শেষপর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ থাকতে না থাকতে পাড়ার ফলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে (মে ১৯৩৯) সঙ্ঘবদ্ধ 'বামপন্থী সমন্বয় কমিটি' ভেঙে যায় এবং কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীরা নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সূচিত হলে ব্রিটিশরা ঘরে বাইরে 'অক্ষশক্তি'র হাতে পর্যুদস্ত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া তখনও আক্রান্ত হয়নি এবং যুদ্ধের চরিত্র নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে তেমন কোন গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়নি। এই সুযোগে সুভাষচন্দ্র শেষপর্যন্ত বিপ্লব প্রচেষ্টা ও শক্তি সংগ্রহের জন্যে দেশের বাইরে অনুসন্ধান করেন।

'কবি অমিয় চক্রবর্তী' প্রবন্ধে নেপাল মজুমদার অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৩৮০) এবং তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য এবং স্বরূপনির্ণয়েরও চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'বাংলাদেশ' কবিতায় বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে দুর্জয় প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান ছিল —

"সারা বাংলাদেশ উপদ্রুত
চেয়ে আছে শিশুচক্ষে; নরনারী মুমূর্ষু আলোয়
অজেয় গৌরব আশা রেখে গেছে, তীব্র হাহাকার
আনে শেষ প্রশ্নোত্তর, আসন্নিক মানব গগনে

পর্জন্যের শঙ্খ ঐ বেজে ওঠে দীর্ণ বঙ্গভূমে
চরম যন্ত্রণাক্ষণে বাংলাদেশে লোকায়ত যারা
ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তারা বিশ্বে আজ হবে অস্বীকৃত?"

অডেন-স্পেন্ডারদের মতো অমিয় চক্রবর্তী মার্কসবাদী প্রগতি শিবিরের 'কমিটেড' লেখক না হলেও যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন প্রতিবাদ ও সংগ্রামে মুখর ছিলেন। তাঁর প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীমজুমদার তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীতেই শ্রীচক্রবর্তীর কবিজীবন সম্পর্কে সারবান মন্তব্য করেছেন— "অমিয়বাবু মূলত একজন মানবতাবাদী কবি। তিনি ভালোবেসেছেন নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত মানুষকে। একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথের মহান ক্রোধ ও ঘৃণা এবং অভিসম্পাতকারী বজ্রকণ্ঠ তেমন করে তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়নি, কিন্তু উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের প্রত্যয়ী তাঁর দরদ ও সহানুভূতি হৃদয় হতে স্বতই উৎসারিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে অত্যাচারী ও শোষকদের তীব্র ঘৃণার অনলে দগ্ধ করতে চেয়েছে। সর্বোপরি আফ্রিকা ও এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।"

'মূলত জীবন ও মানবমুখীন কবি' অমিয় চক্রবর্তী সেই যুগের প্রগতি শিবিরভুক্ত কবি হলেও মার্কসবাদ বা বিশেষ রাজনৈতিক মতের কোনো কমিটেড কবি ছিলেন না। মানুষ এবং জীবন ও প্রকৃতিতে অনুরক্ত কবির যা কিছু দায়বদ্ধতা তা বিশ্বমানবের প্রতিই। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি মানুষের প্রত্যয়ী কখনও আস্থা হারাননি এবং এই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই নিজের কবিসত্তাকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন বলে শ্রীমজুমদার মন্তব্য করেছেন। তাই অডেন-স্পেন্ডারদের এবং প্রায় একই সঙ্গে যখন বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ এদেশের কবিদের 'পতন' হলে তাঁরা তাঁদের শিবির ত্যাগ করে যান, অমিয় চক্রবর্তী তখনও তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে স্থির ও অটল দাঁড়িয়ে কাব্যসাধনায় রত থাকেন। প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বুদ্ধদেব প্রমুখেরা তাঁদের সাহিত্যে মানুষের আদিম রিপু ও প্রবৃত্তিকে উন্মথিত করে প্রতিষ্ঠিত হবার কী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, এমনকি আদালতেও অভিযুক্ত হন। অমিয় চক্রবর্তী কখনওই এই প্রতিক্রিয়ার শিকার হননি, বরং 'বাংলাসাহিত্যে নির্মল ও বিশুদ্ধ বাতাস প্রবাহের' জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

'রবীন্দ্র বিদূষণ ও রবীন্দ্র গবেষণা চর্চা: অমিয় চক্রবর্তী' প্রবন্ধে শ্রীমজুমদার তথ্য সহযোগে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই শুধু নয়, মৃত্যুর পরেও তাঁকে তীব্র নিন্দা, সমালোচনা ও বিদূষণের মধ্যে পড়েতে হয়েছে। 'কল্লোল' লেখকগোষ্ঠীদের রবীন্দ্র বিদ্রোহের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সজনীকান্ত দাস ও তাঁর অনুগামীরা অত্যন্ত অশালীন ও কুৎসিত ভাষায় শনিবারের চিঠি পত্রিকায় রবীন্দ্রবিদূষণের পাশাপাশি রবীন্দ্র স্নেহধন্য ও গুণমুগ্ধ সাহিত্যিকদের আক্রমণ করেন। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব অমিয় চক্রবর্তী শনিবারের চিঠি-এর রবীন্দ্র বিদূষণের তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা করে বিচিত্রা-য় (শ্রাবণ ১৩৩৫)'সাহিত্যব্যবসায়' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখলে বিরুদ্ধপক্ষের অপপ্রচার শুরু হয় যে এটি অমিয় চক্রবর্তীর 'বকলমে' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের

লেখা। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর নাম যুক্ত করে নানা গোষ্ঠী থেকে যে আক্রমণ চালানো হয় তা তাঁদের দুজনের পক্ষেই চরম অসম্মান ও অবমাননাকর হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের খাস কলমচী' 'একান্ত সচিব' ইত্যাদি অভিধা প্রযুক্ত হয়ে শ্রীচক্রবর্তীর অবস্থাটা 'সবচেয়ে শোচনীয়' হয়ে দাঁড়ায় যে এর বাইরে তাঁর যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি-র প্রাথমিক পর্বের অপরাধের কিছুকাল পরে সজনীকান্ত রবীন্দ্ররচনার গবেষণা-অনুসন্ধানের কাছে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ এবং রবীন্দ্ররচনা ও তথ্যাদির অনুসন্ধানেই নয়, এইসময় বিশেষত পঞ্চাশ-ষাটের সময়ে রবীন্দ্র-বিদূষণ এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার অবমূল্যায়ণে যাঁরা নব উদ্যমে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, সজনীকান্ত তাঁদের যুক্তিখণ্ডন করে কবির মহিমা ও মর্যাদাকে তুলে ধরেছিলেন।

বিশ্বভারতীর বন্ধুরা: গান্ধীজী ও কয়েকজন গ্রন্থটি 'বিশ্বভারতী: উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য', 'বিশ্বভারতী: দেশেবিদেশে কবি সাহায্য ভিক্ষায়' ও 'বিশ্বভারতীর বন্ধু গান্ধীজী' — এই তিনটি প্রবন্ধের সমাহারে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থকার নেপাল মজুমদার বিশ্বভারতীর ভাবনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার পটভূমিকার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের হিতৈষী বন্ধুদের অবদানের কথা জানিয়েছেন। 'বিশ্বভারতী: উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' প্রবন্ধে বিশ্বভারতী নির্মাণের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর পঁচাত্তর বছর পূর্তির পরে নানা সমস্যা জর্জরিত বিপর্যস্ত এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমালোচনা শুরু হয়েছিল। কেউ কেউ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রবীন্দ্রনাথকেই দায়ি করেছেন। বিশ্বভারতীর মূল আদর্শ লক্ষ্য এবং শিক্ষানীতির প্রশ্নে গলদ রয়ে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪) পৈশাচিক বর্বরতা এবং বিশ্বজোড়া নরহত্যা ও ধ্বংসলীলার নিদারুণ অভিঘাতে শান্তিনিকেতনেই বিশ্বমানবের এবং আন্তর্জাতিক মিলনতীর্থরূপে বিশ্বভারতী গড়ে তোলার কথা কবির মনে আসে। মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতনে কথিত বক্তৃতায় (৭ পৌষ ১৩২১), ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত 'Nationalism' ও যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতামালায় তাঁর যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাই। রথীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিতে (১১ ও ২৮ অক্টোবর ১৯১৬) 'সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র' রূপে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার কথা পাওয়া যায়। মহাযুদ্ধ শেষের পরে পৌষ উৎসবের সময় (২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮) বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। অসহযোগ আন্দোলন সহ দেশের মুক্তি আন্দো;লনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় (৭ পৌষ ১৩২৮)। বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান অঙ্গ রূপে শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনা কবির অন্যতম কৃতিত্ব। বিশ্বভারতীর বাস্তব সমস্যা ও পন্থা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, গঠন পরিষদ সম্পর্কে শ্রীমজুমদার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক সিল্‌ভ্যা লেভি ও তাঁর স্ত্রী, লেনার্ড এলমহার্স, পিঙ এমঙ বিন্‌টারনীজ, ভিঙ লেস্‌লি, মিস ফ্লাউম, বগদানভ, মার্ক কলিন্স, স্টেন কনো, এফঙ বেনোয়া, পেট্রিক গেডিস্, লিনঙ ওঙ চিয়াং, সিঙ এফঙ এন্ড্রুজ প্রমুখ সারা বিশ্বের বিখ্যাত পণ্ডিত চিন্তকেরা বিশ্বভারতীর সূচনাপর্বে পড়িয়েছেন ও তার উন্নতিতে নানাপ্রকার

সহায়তা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, অসিতকুমার হালদার, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়, সরোজকুমার দাশ প্রমুখের অবদানও অবিস্মরণীয়। শ্রীমজুমদার বিশ্বভারতীর প্রথম পর্বের এই সময়টাকে 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করেছেন।

৩

রবীন্দ্রনাথ: কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ (১৯৯৯) ও রবীন্দ্রনাথ: শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে (২০০০) গ্রন্থদুটির মধ্যে নেপাল মজুমদারের নানা সময়ের রবীন্দ্রচর্চার পাশাপাশি রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চার পরিচয় যেমন ফুটে ফুঠেছে তেমনই তাঁর মনের বহুমাত্রিক অনুসন্ধিৎসু আদলটিও পাঠকের কাছে প্রভাত হয়ে ওঠে। প্রবন্ধের নামগুলির মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্যও প্রকাশ পেয়েছে। যে বিষয়গুলি ভারতে জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে সেই বিষয়গুলির প্রসঙ্গ আলোচনা সূত্রে এলে গ্রন্থদুটির মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে অনেক নতুন নতুন বিষয়ে নতুন তথ্যের আলোকে পরবর্তী দুটি গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থ দুটিকে স্বভাবতই শ্রীমজুমদারের মহাগ্রন্থ ভারতে জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের পরিপূরক রূপে বিবেচিত হতে পারে।

'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যপ্রেরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ইম্পীরিয়ালিজম্' ও 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য রক্ষা ও সাম্রাজ্য প্রসার অভিযানে ভারতীয় অর্থ, শক্তিসম্পদ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দুরবল দেশগুলিরমুক্তি আন্দোলন দমন করে তাদের অধীনস্ত করার হীন নীতি ও অপকৌশলের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক শ্রীমজুমদার যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে 'রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বা নিছক শান্তিবাদী ছিলেন না।' নিছক শান্তির জন্যে তিনি শান্তি না চেয়ে সবসময়েই তিনি যুদ্ধের মূল কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের প্রায় সব যুদ্ধি সাম্রাজ্য প্রসার ও রক্ষার যুদ্ধ। সবক্ষেত্রেই কবি আগ্রাসী ও আক্রমণকারীদের তর্জনী তুলে চিহ্নিত ও ভৎর্সনা করে তাদের প্রতিনিবৃত্ত হবার আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যদিকে আক্রান্ত দেশগুলির প্রতি নৈতিক সমর্থন ও মর্মবেদনা জানিয়েছেন।

'নাৎসী অভ্যুদয়: রবীন্দ্রনাথ ও সৌমেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে জার্মানির নাৎসী কার্যকলাপ সম্পর্কে রবীন্দ্র-সৌমেন্দ্রের আদর্শগত অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। সৌমেন্দ্রনাথের জার্মানিতে গ্রেপ্তার ও মুক্তির পরে তিনি নাৎসী জার্মানির পীড়ন-অত্যাচারের বিবরণ দেন। এইসব ঘটনার অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক 'কালান্তর' প্রবন্ধটি লিখিত। কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনপুষ্ট সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় পত্রিকায় 'কালান্তর' (শ্রাবণ ১৩৪০) প্রকাশিত এই প্রবন্ধে কবি জার্মানিতে ফ্যাসিস্তদের 'উন্মত্ত দানবিক' আত্মপ্রকাশে তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে

প্রাবন্ধিক বিরুদ্ধ অভিযোগগুলিকে খণ্ডন করে লিখেছেন, তাতে কবিকে ঘিরে প্রবন্ধিকের ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুরক্তির স্বতোৎসারিত প্রকাশ ঘটেছে — "সমস্ত স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে এই ধিক্কারবাণী, এবং সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই উদাত্ত আহ্বানবাণী, কবির হৃদয়ের গভীর মর্মমূল হতে স্বতঃউৎসারিত ও উচ্চারিত হয়েছে — কারো দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে নয়, এটা বলাই বাহুল্য। আর হিটলারী নাৎসী নাৎসীবাদকে তার প্রায় একেবারে শুরুতেই যে কবির চিনতে ভুল হয়নি, — এবং ফ্যাসিস্ত ও নাৎসীদের মধ্যে তিনি যে কোনো পার্থক্য দেখেননি, — উভয়কেই তিনি যে কঠোর ভাষায় নিনা করে 'বিনিপাত' করলেন, এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সৌমেন্দ্রনাথ 'পরিচয়' পত্রিকায় কবির এই বিখ্যাত প্রবন্ধটি পড়ে থাকলে তাঁর ঐ ১ নভেম্বরের পত্রে কবির বিরুদ্ধে এমন সব প্রগলভ ও ধৃষ্টতাপূর্ণ অভিযোগ করতে সাহসই পেতেন না।" চিঠির সূত্র ধরে সৌমেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রাবন্ধিক পাল্টা অভিযোগ এনেছেন, যদিও বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিতে কখনোই বিসর্জন দেননি — "ইউরোপে ভয়াবহ দুর্নাম ও অপপ্রচারের ভয় দেখিয়ে সৌমেন্দ্রনাথ কবির কাছ থেকে নাৎসীবাদ-বিরোধী একটি বিবৃতি সংগ্রহ করে নিয়ে রোল্যাঁ, বারব্যুস প্রমুখ ইউরোপের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাহবা নিতে চেয়েছিলেন।"

জার্মান নাৎসীবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ অবশ্য ওয়াকিবহাল ছিলেন। প্রসঙ্গত, সৌমেন্দ্রনাথ দেশে ফেরার (নভেম্বর ১৯৩৫) পর যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে সৌমেন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

'সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা, যৌন সমস্যার স্থান প্রভৃতি বিষয়ে সমকালীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বিতর্ক উত্থাপনের প্রেক্ষিতে প্রাবন্ধিক শ্রীমজুমদার প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল আগে এইসব প্রশ্ন নিয়ে বাংলার সাহিত্যিক মহলে তুমুল তর্কবিতর্ক ও বাদবিতণ্ডার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অমল হোম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব চন্দ প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের রথী মহারথীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। কল্লোল, কালিকলম এবং শনিবারের চিঠি-র গোষ্ঠীর মধ্যে এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। এই বিতণ্ডায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বক্তব্য কী ছিল, প্রাবন্ধিক তার তথ্যপূর্ণ উপস্থাপন করেছেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'কল্লোল'-'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'র নবীন সাহিত্যিকদের যৌনলালসা ও যৌনবিকৃতিমূলক সাহিত্য রচনাগুলি 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্তদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এইসব সাহিত্যিকদের উদ্‌ভ্রান্ত ও উৎকেন্দ্রিক সাহিত্যের পিছনে কোনো

মহৎ ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ ছিল না। আধুনিক ইউরোপের অবক্ষয়ী শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল। গোর্কি তাঁদের ঠিক আদর্শ নন, এমনকি বালজাক, হুগো, তুর্গেনিভ, টলস্টয় প্রমুখও তাঁদের সামনে ছিলেন না। শনিবারের চিঠি এইসব সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে ক্রমাগত আঘাত হেনে চলে, সেইসঙ্গে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের পুরোধাদের এইসব রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করার অনুরোধ জানান।

'বাংলা নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথ', 'মেঘনাদবধকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ', 'গোচারণের মাঠ' 'নদী'—': 'বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধগুলিতে ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।'বাংলা নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডিরোজিও, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলার নবজাগরণের যে সূচনা হয়েছিল, 'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেন তার পূর্ণ বিকাশ এবং একটা পরিণত রূপ'-এর সন্ধান করা হয়েছে। ইউরোপের রেনেশাঁস সাধারণত যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী। অন্যদিকে বাংলার নবজাগরণ বিশেষত রবীন্দ্রনাথের যুগে ছিল বিশ্বমানবিক এবং বৈজ্ঞানিক। রামমোহনের বিশ্ববোধ ও মানবচিন্তার উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ এই চেতনার সম্প্রসারণ ঘটান।বাংলার নবজাগরণের সবচেয়ে বড় অবদান হল আধুনিক যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিতে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার ধারার প্রবর্তন। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ, মাতৃভাষায় জনশিক্ষা, সর্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষা, জনশিক্ষা নীতি, ইউরোপীয় রেনেশাঁসের অসঙ্গতি, বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিকতাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থন, বিজ্ঞানশিক্ষা ও চেতনা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন, নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতি, শিল্প-সাহিত্য-ললিতকলা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত ও অবস্থান তাঁর নানা রচনার উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিক শ্রীমজুমদার ফুটিয়ে তুলেছেন।এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণের থেকে উদ্ধৃতি চয়নে বেশি ঝোঁক রয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্য-এর 'একটি রীতিমতো সমালোচনার' উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবৃত্ত হয়ে একে একে রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, লক্ষ্মণ, রাম, সীতা, প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রধান প্রধান চরিত্রচিত্রণের দুর্বলতাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখান। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার নানাপর্বের প্রবণতার আলোচনা করে নেপাল মজুমদার'মেঘনাদবধকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।যখন 'ন্যাশানাল থিয়েটার' মাইকেলের মেঘনাদনাধ কাব্য নাট্যরূপে মঞ্চস্থ করতে চলেছেন সেই সময়ে বালক রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ'-এর তীব্র সমালোচনা করে ভারতী-তে এক দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখলেন। কবির বয়স ষোল বছর মাত্র। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী ও মেঘনাদবধ কাব্য প্রায় একইসঙ্গে রচনা করেন, সেইবছর রবীন্দ্রনাথের জন্ম। দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মধুসূদনের গুণগ্রাহী ছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্য-এরভারতী পত্রিকায় (শ্রাবণ ১২৮৪, ভাদ্র ১২৮৪, পৌষ ১২৮৪, ফাল্গুন ১২৮৫) প্রকাশিত সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র

ভট্টাচার্যের অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণ-এর তুলনা টেনে রাবণের রাজসভার বর্ণার পাশে মধুসূদনের বর্ণনাকে তীব্র শ্লেষে বিঁধেছেন — "ইহা কি রাবণের সভা? ইহা নাট্যশালার বর্ণনা!" দশাননের 'তিতিয়া বসনে' কাঁদার চিত্র সম্পর্কে তাঁর ঠেস 'গালে হাত দিয়ে একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে'। আবার হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার-এর বর্ণনার তুলনায় 'রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব' দেখেছেন। তবে কাব্যে 'রাবণের থেকে ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা উত্তম বর্ণিত' বলে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। প্রাবন্ধিক শ্রীমজুমদারপ্রবন্ধে দুটি প্রশ্নের বিচার করেছেন — প্রথমত, মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে 'রবীন্দ্রনাথের অসংযত ভাষা ও মন্তব্যগুলি' ব্যতীত 'এই সমালোচনার মোটাকথাটার' কোন সারবস্তু আছে কিনা? দ্বিতীয়ত, এই কাব্য সম্পর্কে এই সব সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের নাকি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরাবাড়ির অনেকের?

জীবনস্মৃতি, 'বিদ্যাসাগর' বা 'বঙ্কিমচন্দ্র' বিষয়ক লেখায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের সৃষ্টিশীল প্রতিভা এবং বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। জাভা যাত্রার আগে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধর্ম' বিচিত্রা-এর জন্যে জুলাই ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে লিখিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত তর্ক উঠেছিল। এইসময় 'বিচিত্রাভবন'-এ রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ভাষণে আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও জনক হিসাবে মধুসূদনের প্রতি মূলত কাব্যরীতি ও ছন্দ আলোচনার সূত্রে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। গিরিশচন্দ্র রাবণবধ, সীতার বনবাস, অভিমুন্য বধ লিখলে রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় (মাঘ ১২৮৮) তাঁকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন যে এটিই 'যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ' এবং এতে 'ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও মিষ্টতা' রক্ষা পেয়েছে। শ্রীমজুমদার প্রশ্নসূচক মন্তব্য করেছেন — 'গৈরিশ ছন্দে যদি মাইকেল প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ পূর্ণতা লাভ করে থাকে, তা হলে কি বাংলা নাট্যমঞ্চে, — বিশেষ করে যাত্রা নাটকে দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল ব্যাপীও তার প্রভাব চলে আসছে না? অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে কি মাইকেল প্রকৃত সন্ততিহীন? এইসব প্রশ্ন থেকে যায়।"

রবীন্দ্রনাথ ছন্দ (১৯৩৬) গ্রন্থে বাংলা কাব্য সাহিত্যে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অবদান ও তার ত্রুটি বিচ্যুতির আলোচনা করেছেন। প্রায় সমসাময়িক একটি ভাষণে 'বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' (১৩৪১) তিনি গদ্যে রামমোহনের পরেই কাব্যরচনার ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম জনক রূপে মধুসূদনের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। শ্রীমজুমদারের মতে, বাংলা কাব্যসাহিত্যে ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনের মহান অবদানের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তাঁর কোনো লেখা বা ভাষণে এমন উচ্ছ্বসিত হননি।রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রামমোহনের পরে মধুসূদনের নাম না করেই বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের কথা বলেছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধে রামমোহনের পরে মধুসূদনের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ করেছেন, বিদ্যাসাগরের নামও উল্লেখ করেননি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য সাহিত্য এবং ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনের অবদানের ইতিমূলক দিকের উপর গুরুত্ব দিলেন। কিন্তু এর পরেই ছন্দ গ্রন্থে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর

ছন্দের 'ক্রিটিক্যাল' সমালোচনা করেন। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণশক্তি ও স্বচ্ছন্দ গতিপ্রবাহ সংস্কৃত ও ততম শব্দ ব্যবহারের ফলে কতখানি ব্যাহত হয়েছে আর সেইস্থানে চলতি ও লৌকিক শব্দ ব্যবহারের কতখানি প্রাণবন্ত হতে পারে তা কবি নিজে তার দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসের ব্যর্থতা এবং মাতৃভাষার প্রতি মুখ ফেরানোর ঐতিহাসিক ঘটনা ও শিক্ষার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে করেছেন সেইদিকে শ্রীমজুমদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যচিন্তার 'ভারতীয় নৃত্য: রবীন্দ্রনাথ উদয়শংকর ও গুরুসদয়' প্রবন্ধটি ভারতীয় নৃত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে বিবেচিত হতে পারে। ভারতীয় নৃত্যকে সর্বপ্রথম দেশ ও বিশ্বের কাছে মহিমা ও মর্যাদার সঙ্গে দুইজন ভারতীয় শিল্পী ও শিল্পশাস্ত্রী প্রতিষ্ঠা করেছেন। একজন উদয়শঙ্কর, অন্যজন গুরুসদয় দত্ত। উদয়শঙ্করের আবির্ভাব এবং তাঁর সৃষ্টি ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে বেগবান করে। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন — উদয়শঙ্করের নাচে তাঁর আত্মশক্তি ও শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটেছে। তবে আঙ্গিক দিকের ঔৎকর্ষ থাকলেও ভাবিক দিকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ। ভারতনাট্যম, কথাকলি, কত্থক প্রভৃতি বিস্মৃত ও অবলুপ্তপ্রায় নৃত্যশিল্পে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে নতুন প্রাণসঞ্চার ঘটে, যাকে নেপাল মজুমদার 'পুনরুজ্জীবন বা পুনরভ্যুদয়' বলতে চেয়েছেন। অন্যদিকে গুরুসদয় দত্ত বাংলার 'রাইবেশেঁ' এবং সারি, জারি, বাউল প্রভৃতি লোকসংগীত ও নৃত্যের পুনরুদ্ধার করে তাকে স্বদেশ ও বিশ্বের দরবারে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদাদানে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

'সুস্থ ভারত সংস্কৃতি: শ্রীনিকেতনে কারু শিল্প' প্রবন্ধে দেশের কুটিরশিল্প ও গ্রামোদ্যোগ, শ্রীনিকেতনের শিল্পবিভাগকে নিয়ে কবির ভাবনা আলোচিত হয়েছে। কবি শিল্পবিভাগকে বিরাট কারখানা-ঘরে রূপান্তরিত না করে গ্রামের বিপুল সংখ্যক কারুশিল্পী ও বেকারদের এখানে শিক্ষিত, দক্ষ ও পারদর্শী করতে আগ্রহী ছিলেন। গ্রামের কারুশিল্পীদের শিল্পচেতনা ও সৃষ্টিশক্তিকে শ্রীনিকেতন মুক্তি দেবে, তারা একসময় সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে — এই ছিল কবির স্বপ্ন ও সাধনা। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনাকাল থেকে সেখানকার শিক্ষাবিধি এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ও অন্যান্য বিধি-বিধান ও ছাত্রদের স্বাধিকার দানের ক্ষেত্রে কবির চিন্তন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক শ্রীমজুমদার আলোচনা করেছেন। কবির এই চিন্তন ও তার সুচিন্তিত প্রয়োগ তাঁর পরবর্তী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রচনার ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম শিল্পসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তাকে শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দান করেন যা 'একটা বড়ো রকমের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা ও তার মূল ভিত্তিভূমি রচনা' করেছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে বিকল্প সাংস্কৃতিক প্রদর্শশিল্প এবং আনন্দোৎসব রূপে ঋতু উৎসব ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে কবি শান্তিনিকেতনে

অসাম্প্রদায়িক সুস্থ পরিবেশ ও পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ: বিশ্বভারতী ভাবনা' প্রবন্ধে শ্রীমজুমদার কবির সমন্বয়বাদী শিক্ষাদর্শের ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ: ঋতু উৎসব' প্রবন্ধে আধুনিক ভারত ও বঙ্গ সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ঋতু উৎসব প্রবর্তনের 'বিরাট' ও 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে। স্রষ্টা-শিল্পী রূপে রবীন্দ্রনাথ ভারতসহ সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয় ও অনন্য। সমগ্র বিশ্বে তিনি ষড়ঋতুর পূর্ণাঙ্গ আনন্দোৎসব-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় অগ্রণী, সাফল্য ও স্বার্থকতাতেও।

'বন্দর নগর, গঙ্গা ও সমুদ্র দূষণের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে নেপাল মজুমদার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। স্বাস্থ্যকর বা সুস্থ পরিবেশ এবং বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক নগরায়ণ অনুযায়ী নতুন নগর ও বসতি স্থাপনের কোনো মহান আদর্শ পুঁজিবাদীদের নেই। যেমন করেই হোক মুনাফা লাভই তার প্রধান লক্ষ্য যা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের মূল চালিকাশক্তি। আকাশ ও বায়ু-দূষণ কিংবা গঙ্গা-দূষণই নয়, আধুনা সময়ের বাণিজ্য দানবের অপরিসীম মুনাফা লালসা যেভাবে সমুদ্র-দূষণ করে চলেছে, যৌবনের সূচনা থেকে কবির মনকে তা গভীরভাবে ক্ষুব্ধ ও পীড়িত করে তুলেছিল। জীবনের শুরুতে বিলেতযাত্রার পথে খিদিরপুরের জেটি এবং এডেন বন্দর, পরে জাপানযাত্রার পথে রেঙ্গুন বন্দরের কুৎসিত ক্লেদাক্ত রূপ দেখে তাঁর মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা জাপান-যাত্রী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্যের তুলনামূলক আলোচনা করে কবি সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির পার্থক্য সংক্ষেপে নির্দেশ করে পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিস্বার্থ ও মুনাফা সর্বস্বতা কীভাবে প্রাচীন বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে কুশ্রী কদর্য ও ক্লেদাক্ত করে চলেছে তা বর্ণিত হয়েছে। কবি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নন। তিনি পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় 'বাণিজ্যদানবকেও একদিন তার দানবলীলা সম্বরণ করে মানব' হওয়ার কথা বলেছেন। সংস্কৃতি সম্পর্কে কবির এই মূল কথাটাই শ্রীমজুমদার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

৪

রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে নেপাল মজুমদার এইকথা বারংবার স্মরণে রেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি ও শিল্পী। বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও তাঁর কাব্য ও শিল্পসৃষ্টি অবিরাম ছিল। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভাষা ও শব্দতত্ত্ব, কাব্য, সংগীত, নৃত্যনাট্য, চিত্রশিল্প সকলক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম প্রায় সমভাবে প্রবহমান ছিল। সেইসঙ্গে কবির প্রিয় 'বিশ্বভারতী'র দায়িত্ব আজীবন তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিশাল ক্যানভাসে ধরার পরিকল্পনা শ্রীমজুমদার করেছিলেন সেই পরিকল্পনার রূপায়নে কার্যত তিনি সমগ্র জীবন ব্যাপৃত থেকেছেন। অর্থাৎ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ রচনার পরবর্তী কালে তিনি যে সকল সারস্বতকর্ম করেছেন তার প্রায় সবটার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কোনো না কোনোভাবে যুক্ত। সেই

অর্থে তিনি সমগ্র সারস্বত জীবনে রবীন্দ্রনাথকেই নানাভাবে অনুসন্ধান করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রমুখ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন যা তাঁর সিদ্ধির পরিচায়ক।

বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত শ্রীমজুমদারের গদ্যচর্চা বামপন্থী চিন্তক ও অনুসন্ধিৎসুদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তবে বিরল ঔদার্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গদ্য কখনো কখনো রাজনৈতিক দর্শনের ভারে কিছুটা ক্লান্ত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গন্তব্য পূর্বনির্ধারিত বলে সংশয় জাগে, কখনো কখনো একই ভাবনা বলয়ের চারপাশে চিন্তাসূত্রগুলিকে ঘোরাফেরা করতে দেখি। তবে এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি নিজে যে ওয়াকিবহাল ছিলেন, পরবর্তীকালের গবেষণায় তাঁর অনুসন্ধিৎসার বিষয় নির্বাচন ও আগ্রহের মধ্যে তার পরিচয় মেলে। তিনি নিজেকে বারংবার নতুন নতুন বিষয়ে তথ্যসন্ধানে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, গদ্যেও নিজেকে অনুসন্ধানের নিরীক্ষা করেছেন। শ্রীমজুমদারের গদ্যভঙ্গী কাব্যময় সুখপাঠ্য তরল গদ্যের বাহন নয়, সংবেদনগ্রাহ্য হলেও তা সোজাসুজি সত্যকে জানান দেওয়ার 'গদ্যের কড়া হাতুড়ি'। 'দায়বদ্ধ' বামপন্থী বুদ্ধিজীবী শ্রীমজুমদারের সারস্বতচর্চার গতিমুখ খুব স্পষ্ট — জাতীয়তাবাদী হয়েও বিশ্বমানবতাবাদের প্রতি তাঁর নিটুট আস্থা গদ্যের মধ্যে বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। মার্কসবাদী সমালোচনা ধারায় তাঁর সমগ্র বিদ্যাচর্চা তাৎপর্যময়। সমগ্র জীবন ধরে তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার মেলবন্ধন করে গেছেন। তাঁর গদ্যচর্চার মহাকাব্যিক বিস্তারে এক বিশেষ ধরনের পাঠ তৈরি হয়েছে, সাহিত্যের 'সত্য'কে নানাদিক থেকে বিচার করার ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে বিবেচ্য।